৫

# প্রেষণাঃ মৌলিক ধারণাসমূহ
## Motivation: Basic Concepts

ব্যবস্থাপকেরা যেসব কাজ করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কর্মীদেরকে প্রণোদিত/পুরস্কৃত করা। প্রেষণা একটি জটিল কাজ। কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে; পোষণ করে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা আর কাজের প্রতি থাকে এককে ধরনের মনোভাব। কেউ কেউ জন্মগতভাবেই নাখোশ প্রকৃতির, কেউ কেউ একটুতেই পরিতৃপ্ত। তাই ব্যক্তির মানসিক গঠন, শিক্ষাগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতধারা, কাজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একজন কর্মী যে কারণে প্রেষিত হবেন, আরেকজন সেকারণে প্রেষিত না-ও হতে পারেন, একজন কর্মীর হয়তো বেতন বাড়ালেই সে প্রেষিত হয়, আরেকজন হয়তো প্রশংসায় প্রেষিত হয়। এসব কারণেই ব্যবস্থাপকের জন্য প্রেষণার কাজটি খুবই জটিল। প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে প্রেষণার এ গুরুত্বের কারণে আমরা এ ইউনিটে প্রেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করবো।

| ইউনিট সমাপ্তির সময় | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ |
|---|---|

**এ ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ - ১: প্রেষণার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ - ২: প্রেষণার আদি তত্ত্বসমূহ
পাঠ - ৩: প্রেষণার সমসাময়িক তত্ত্বসমূহ
পাঠ - ৪: লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

# পাঠ ৫.১ প্রেষণার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
## Concept, Characteristics and Importance of Motivation

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- প্রেষণা সম্পর্কে বলতে পাবেন।
- প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রেষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা। প্রেষণাকে কতিপয় শক্তির সমষ্টি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বলা হয় যে, প্রেষণা হলো কতিপয় শক্তির সমাহার যার কারণে মানুষ বিশেষভাবে আচরণ করে। প্রেষণা মানুষের অন্তরে নিহিত একটি সুপ্ত শক্তি যা উজ্জীবিত হলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করে। প্রেষণা একটি প্রয়োজন পূরণ (Need Satisfying) প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় অতৃপ্ত প্রয়োজন দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় টেনশন হ্রাসের মধ্য দিয়ে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

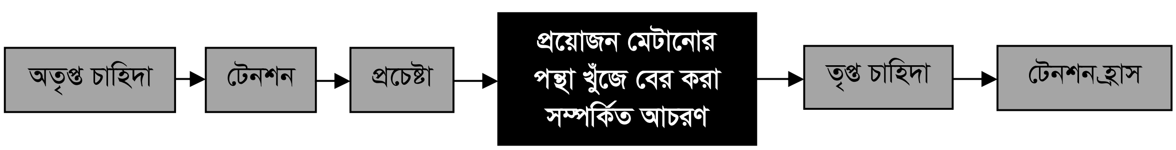


সুতরাং বলা যায়, মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অনুপ্রেষিত (Motivated) ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বীয় উদ্যোগে, অধিকতর দক্ষতার সাথে তার কর্মসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব। মানুষের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ হলে সে প্রেষিত (বা অনুপ্রেষিত) হয়েছে বলা যায়।

প্রেষণা কী তা জানা হলো, এবার আসুন, প্রেষণা সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিশারদের মতামত জেনে নিই।

১. **Keith Davis** এবং **H. John W. Newstrom:** কাজের দিকে কর্মীকে ধাবিত করার শক্তিই হলো প্রেষণা (Motivation is the strength at the drive toward an action)।

২. **Michael Jucious:** প্রেষণা হচ্ছে ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীদেরকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।

৩. **H. Weihrich** এবং **H. Koontz:** সব ধরনের চাহিদা, আকাঙ্খা, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সমরূপ শক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ পদবাচ্যকে প্রেষণা বলে (Motivation is a general term applying to entire class of drives, desires, needs, wishes and similar forces)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়া যা কোনো কর্মীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সে তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। কর্মী যাতে তার সর্বোচ্চ পরিপক্কতা (Maximum maturity) প্রয়োগ করতে পারে, মূলতঃ প্রেষণা সেই কাজটি করে থাকে।

## প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

### Characteristics of Motivation

প্রারম্ভিক আলোচনায় আমরা দেখলাম, কর্মী প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ পরিপক্কতা প্রয়োগ করবে। সেটি করার ক্ষেত্রে প্রেষণা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। তাই এটি একদিকে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

**প্রেষণা লক্ষ্যকেন্দ্রিক:** প্রেষণা সবসময়ই লক্ষ্যকেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কর্মীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সেবা আদায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা। প্রেষণা এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্মীদের প্রেষণা দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করার জন্য।

**ধারাবাহিক প্রক্রিয়া:** মানুষের চাহিদা পরিবর্তনশীল । আগে কর্মীদের যেভাবে বা যা দ্বারা প্রেষিত করা হয়েছে কর্মীদের চাহিদার পরিবর্তনের কারণে প্রেষণার ধরনও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সুতরাং বলা যায়, প্রেষণা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। কর্মীদের অনুপ্রেষিত করে কিছু দিন পর বন্ধ করে দিলে সেটি কার্যকর থাকবেনা।

**ইতিবাচক বা নেতিবাচক:** প্রেষণা ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুরকমেরই হতে পারে। X তত্ত্ব ও Y তত্ত্ব থেকে এ ধারণাটি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যা আমরা পরবর্তী পাঠে জানবো। প্রতিষ্ঠানে যখন কর্মীকে পুরস্কৃত করে কাজ উদ্ধার করা যায় তা হবে ইতিবাচক প্রেষণা। আবার কখনো কখনো কর্মীকে তিরস্কার করে কাজ উদ্ধার করতে হয়- এ ধরনের প্রেষণা নেতিবাচক।

**কর্মশক্তি:** প্রেষণা কর্মীদের মধ্যে কর্মশক্তি যোগায়। কোনো কাজ করা বা না-করার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করে। এটা সরাসরি কর্মীর মনস্তাত্বিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেহেতু প্রেষণা কর্মীদের কর্মসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে সেহেতু এটা কর্মীর কর্মশক্তি হিসেবে কাজ করে।

**আর্থিক বা অনার্থিক প্ররোচক:** প্রেষণা আর্থিকও হতে পারে বা অনার্থিকও হতে পারে। কর্মের প্রকৃতি এবং কর্মীর মানসিক অবস্থা অনুযায়ী কর্মীকে আর্থিক বা অনার্থিক প্ররোচক দ্বারা প্রেষিত করা হয়।

**অভাবের সাথে সম্পর্কিত:** কর্মীর অতৃপ্ত চাহিদা বা অভাবের কারণেই প্রেষণার সৃষ্টি। যেমন- কর্মীর যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতির একটি অভাব সে বোধ করবে। প্রতিষ্ঠান যখন তার অভাবটি পূরণ করবে তখন সে অনুপ্রাণিত হবে। এ অনুপ্রেরণা তার মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে আরো সচেষ্ট হবে।

## প্রেষণার গুরুত্ব

### Importance of Motivation

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকেই তার গুরুত্ব কতখানি তা অনুধাবন করতে পারি। আমরা জানি যে, একজন কর্মীর কর্মসম্পাদন তিনটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়- কর্মীর সামর্থ্য, কর্ম পরিবেশ এবং প্রেষণা। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন:

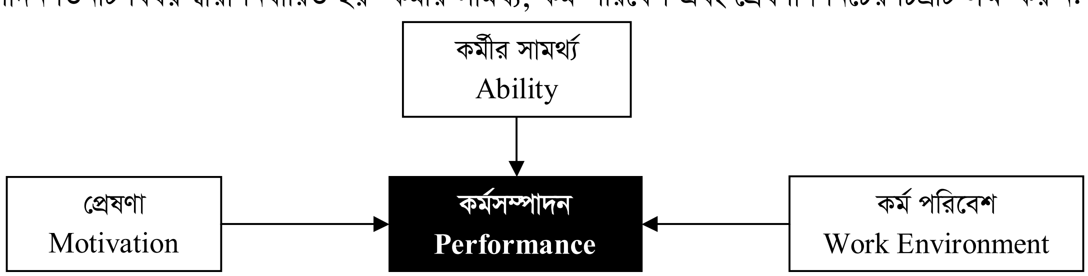


চিত্র: প্রেষণার সাথে কর্মসম্পাদনের সম্পর্ক

সামর্থ্য হলো কর্মীর কাজ করার শক্তি; যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় তথ্য- এগুলো কর্ম পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রেষণা হলো কাজ করার ইচ্ছা শক্তির যোগানদাতা। যদি কোনো কর্মীর কাজ করার সামর্থ্যে ঘাটতি থাকে, ব্যবস্থাপক তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, যদি কর্ম পরিবেশে সমস্যা থাকে, তিনি পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে পরিবেশ উন্নত করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ব্যবস্থাপকের জন্য তা হবে চ্যালেঞ্জিং। প্রেষণার সাথে ব্যক্তিক আচরণের সম্পর্ক থাকার কারণে ব্যবস্থাপক সহজে প্রেষণার জটিলতার রহস্য উন্মোচনে সক্ষম নাও হতে পারেন। তাই কর্ম সম্পাদনের নির্ধারক হিসেবে প্রেষণার গুরুত্বের কারণে এবং এর অদৃশ্যমান চরিত্রের ফলে প্রেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে সংগঠনে প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

**১. উৎপাদন বৃদ্ধি:** প্রেষণা দ্বারা তাড়িত হলে কর্মীরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা অন্যান্য কর্মসম্পাদনে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একে আমরা নিচের সমীকরণের সাহায্যে দেখাতে পারি–

$P = f(a \times m)$

P = কর্মসম্পাদন (Performance), f = অপেক্ষক (function),

a = কর্মক্ষমতা (ability) এবং m= প্রেষণা (Motivation)।

**২. দক্ষতা বৃদ্ধি:** প্রেষিত কর্মীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে এবং কাজকে নিজের মনে করে সর্বভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এতে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্ম-অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়।

**৩. অপচয় হ্রাস:** প্রেষিত কর্মীরা দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়। এতে সময় ও সম্পদ ব্যবহারের অপচয় হ্রাস পায়।

**৪. শ্রমিক আন্দোলন হ্রাস:** যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রেষণা কাম্য পর্যায়ে থাকে, সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ফলে উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

**৫. চাকুরি ত্যাগের হার হ্রাস:** অনুপ্রেষিত কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসম্পাদন করে, কাজে অনুপস্থিতি কমে আসে। ফলশ্রুতিতে, তারা সহজে উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় না। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মী-ঘূর্ণায়মানতা (Labor turnover) হ্রাস পায়।

**৬. সম্পদের সঠিক সংরক্ষণ:** অনুপ্রেষিত কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ নিজ উদ্যোগেই সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি এর সংরক্ষণে ভূমিকা গ্রহণ করে।

**৭. মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** অনুপ্রেষিত কর্মী সব সময়ই অনুপ্রাণিত কর্মী। কর্মসম্পাদনে কখনই এরা পিছপা হয়না। কর্মী তার সকল প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োগ করে। এ জন্য মানব শক্তির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

**৮. ব্যবস্থাপনা-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন:** অনুপ্রেষিত কর্মীদের মধ্যে সব সময়ই প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করে। তারা অণুপ্রাণিত এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই এরা ব্যবস্থাপকদের উপর সন্তুষ্ট থাকে। এতে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এটা বলা যায়, প্রেষণা প্রতিষ্ঠানকে গতিময় রাখে, কর্ম-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং সর্বোপরি কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীবতা আনয়ন করে। তাই প্রেষণা বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের জন্য অপরিহার্য।

## সারসংক্ষেপ

প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা। প্রেষণা হলো কতিপয় শক্তির সমাহার যার কারণে মানুষ বিশেষভাবে আচরণ করে। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় অতৃপ্ত প্রয়োজন দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় টেনশন হ্রাসের মধ্য দিয়ে। কর্মসম্পাদনের নির্ধারক হিসেবে প্রেষণার গুরুত্বের কারণে এবং এর অদৃশ্যমান চরিত্রের ফলে প্রেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেষণা প্রতিষ্ঠানকে গতিময় রাখে, কর্ম-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে, এবং সর্বোপরি কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীবতা আনয়ন করে।

# পাঠ ৫.২ প্রেষণার আদি তত্ত্বসমূহ
## Early Theories of Motivation

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- প্রেষণাদানে চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পাবেন।
- দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রেষণা সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডারিক উইলিয়াম টেইলার (Frederick William Taylor), মাজলো (Maslow), হার্জবার্গ (Herzberg), ম্যাকক্লিল্যান্ড (McClelland) সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কর্মীদের প্রেষণার উপর গুরুত্ব দিয়ে বহু কথা বলেছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো তত্ত্বই সার্বজনীনভাবে প্রেষণার একমাত্র 'মহৌষধ' হিসেবে গৃহীত হয়নি। সব তত্ত্বেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রেষণার তত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯৫০ এর দশক ছিল ফলপ্রসূ সময়। এ সময়কালে তিনটি তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল। এ তত্ত্বগুলো ঐ সময় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিলো, যদিও কোনো তত্ত্বই প্রশ্নাতীত ছিলনা। এখনও কর্মীদের প্রেষণার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বগুলো সর্বাধিক পরিচিত। সমসাময়িক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হলেও দুটি কারণে এ আদি তত্ত্বগুলো সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন-

১. সমসাময়িক তত্ত্বগুলো আদি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
২. ব্যবস্থাপকগণ আজও কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত আদি তত্ত্বগুলো ব্যবহার করার পাশাপাশি কর্মীদের প্রেষণাদানে এ তত্ত্বগুলোর পরিভাষা ব্যবহার করছেন।

আসুন, প্রেষণা সম্পর্কিত বহুল আলোচিত তিনটি আদি তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে নিই।

### চাহিদা-সোপান তত্ত্ব
### Hierarchy of Needs Theory

ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক আচরণ সাহিত্যে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাজলোর (Abraham Maslow) চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি প্রেষণার একটি মৌলিক মডেল হিসেবে বিবেচিত। তিনি ব্যক্তির প্রয়োজনকে চাহিদার সোপানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এ তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদার একটি সোপান বিদ্যমান। চাহিদাগুলো পূরণ সাপেক্ষে একটির পর একটি পূরণে মানুষ সচেষ্ট হয়। এভাবে সে শেষ স্তরে এসে পৌঁছায়। এ চাহিদাগুলো মাজলো গুরুত্বসারে নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন:

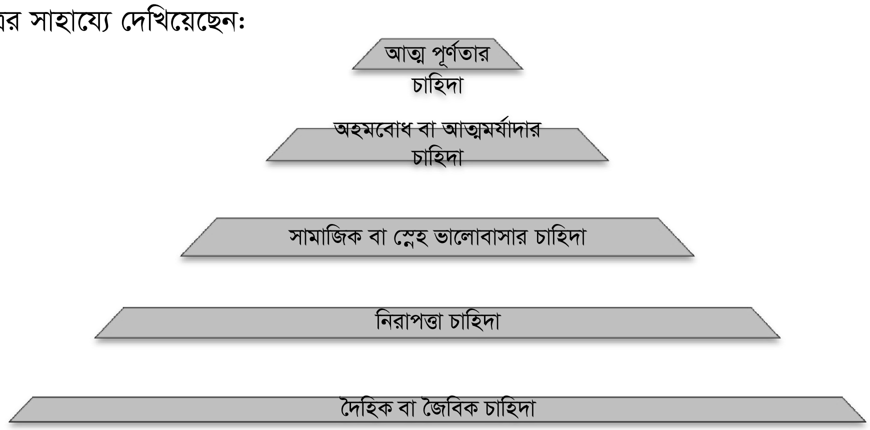


চিত্র: মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্ব

১. **দৈহিক বা জৈবিক চাহিদা (Physiological needds):** যেসব অভাব বা চাহিদা মানুষের দৈহিক বা জৈবিক, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য সেগুলো দৈহিক বা জৈবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন-ক্ষুধা, আবাস, পানীয়, বাসস্থান, বস্ত্র, যৌন সন্তুষ্টি এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজন। মাজলোর মতে, এ চাহিদা পূরণ না করা পর্যন্ত উচ্চ স্তরের চাহিদা পূরণ করে মানুষকে কাজের প্রতি প্রেষিত করা সম্ভব নয়।

২. **নিরাপত্তার চাহিদা (Safety needs):** যেসব চাহিদা মানুষের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার সাথে জড়িত সেগুলোকে নিরাপত্তার চাহিদা বলা হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চাহিদাগুলো হচ্ছে- চিকিৎসা সুবিধা, চাকুরির নিরাপত্তা, আয়ের নিরাপত্তা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা, বার্ধক্যজনিত পেনশন ইত্যাদি। মাজলোর মতে, যখন দৈহিক ও জৈবিক চাহিদা মিটে যায় তখন নিরাপত্তার চাহিদার সৃষ্টি হয় যা মানুষের আচরণকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।

৩. **সামাজিক চাহিদা (Social needs):** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষ বসবাস করে। ফলশ্রুতিতে, মানুষ বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রশাংসা ও ভালোবাসা পেতে সর্বদা আগ্রহী থাকে। পারস্পরিক স্নেহ, মায়া-মমতা, বন্ধুত্বের বন্ধন, অন্যের দ্বারা স্বীকৃতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সামাজিক চাহিদা হিসেবে গণ্য হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক চাহিদার সৃষ্টি হয় তার নিম্ন স্তরের চাহিদাগুলো নিবৃত্তির পর।

৪. **অহমবোধ বা আত্মমর্যাদার চাহিদা (Esteem needs):** এর মধ্যে রয়েছে মানুষের অভ্যন্তরীণ অহম উপাদান, যেমন-আত্ম-সম্মান, কাজের স্বাধীনতা ও কৃতিত্ব অর্জন এবং বাহ্যিক অহম-উপাদান (পদমর্যাদা ও অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ) ইত্যাদি। সামাজিক চাহিদা পূরণ হবার পর মানুষের মান-মর্যাদা বা অহমবোধ চাহিদার উদ্ভব হয়।

৫. **আত্ম পূর্ণতার চাহিদা (Self-actualization):** মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্বে এর অবস্থান সর্বোচ্চ স্তরে। মানুষ তার সৃজনশীলতা এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের স্বপ্ন সবসময়ই লালিত করে। উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে চায়। এ জাতীয় চাহিদার মধ্যে রয়েছে শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ সেবা ইত্যাদি। এটি উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এ ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়না।

মাজলোর চাহিদা-সোপান তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি পূরণ হলে আরেকটির অভাব দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষের অভাব অসীম। আবার একই সময়ে মানুষ একাধিক অভাবের দ্বারা তাড়িত হতে পারে। এ তত্ত্বের অনেক ইতবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বটি সবার কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

## এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব

### Theory X and Theory Y

মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor) দুটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এক্স তত্ত্ব অনুযায়ী, কাজের প্রতি মানুষের স্বভাবগত অপছন্দ (disliking) রয়েছে- যার দরুন কর্মীরা সম্ভব হলে কাজ পরিহার করে চলতে চায়। অধিকাংশ মানুষ অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে পছন্দ করে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়। ফলশ্রুতিতে, কাজ হয়ে পড়ে গৌণ এবং সে কারণে কর্মীদেরকে দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য ব্যবস্থাপকদেরকে তৎপর হতে হয়। এ তত্ত্বটি একটি নিরাশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মানুষকে অলস, কর্ম-বিমুখ এবং ফাঁকিবাজ হিসেবে দেখা হয়েছে।

থিওরি ওয়াই আশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, কাজ মানুষের কাছে খেলা বা বিশ্রামের মতোই স্বাভাবিক বিষয়। মানুষ কাজ করতে চায় এবং কাজ থেকে সন্তুষ্টি পায়। আরো মনে করা হয় যে, মানুষের শুধু দায়িত্ব গ্রহণ করারই ক্ষমতা আছে তা নয়, তারা দায়িত্ব পেতেও চায়। তারা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার বিকাশ ঘটায় এবং সেগুলো প্রয়োগ করে। তাই কর্মীদের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য

ব্যবস্থাপকদের কর্তব্য হলো, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে কর্মীরা আত্ম-উন্নয়নের সুযোগ পাবে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন।

## দ্বি-উপাদান তত্ত্ব

**Two-Factor/Motivation-Hygiene Theory**

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে ফ্রেডারিক হার্জবার্গ (Frederick Herzberg) ও তাঁর সহযোগীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০ জন ইঞ্জিনিয়ার ও একাউন্ট্যান্ট- এর কর্ম মনোভাব (Job Attitude) এর উপর একটি গবেষণা পরিচালিত করেন। উত্তরদাতাদের উত্তরগুলোকে তিনি ১৬টি শ্রেণিতে ভাগ করেন। ডান পাশের উপাদান গুলোকে কর্মসন্তুষ্টির নির্দেশক এবং বাম পাশের উপাদান গুলো কর্মঅসন্তুষ্টির নির্দেশক হিসেবে দেখানো হয়। নিচের চিত্রটি দেখুন:

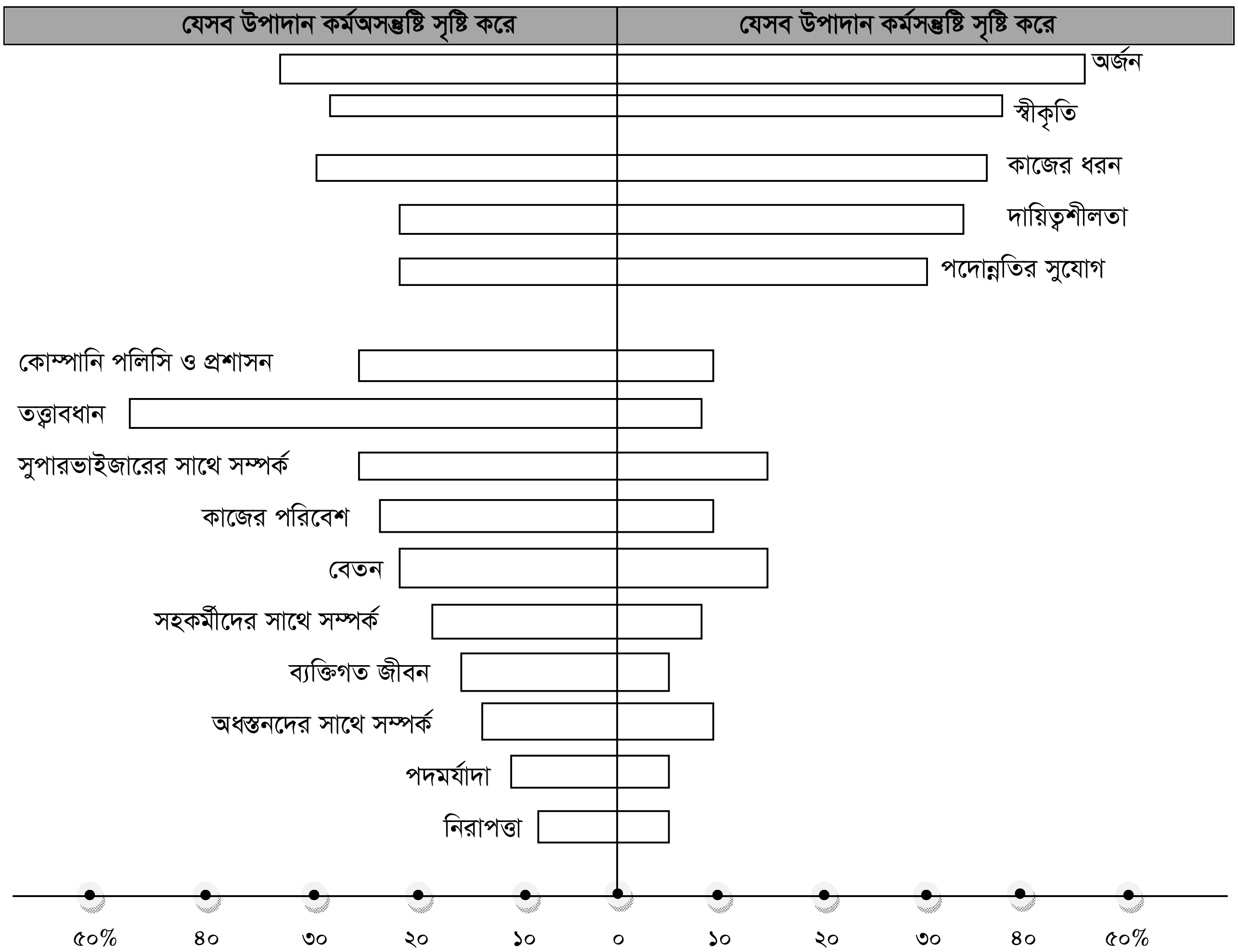


তথ্যের ভিত্তিতে হার্জবার্গ বলেন যে, 'সন্তুষ্টির বিপরীত অসন্তুষ্টি নয়।' সন্তুষ্টির বিপরীত হলো সন্তোষ বা অসন্তোষ কোনোটাই নয় (no satisfaction) এবং অসন্তুষ্টির (dissatisfaction) বিপরীত হলো অনাসন্তোষ (no dissafisfaction)। হার্জবার্গের ভাষায়, ''The opposite of 'satisfaction' is 'no satisfaction' and the opposite of 'dissatisfaction' is 'no dissatisfaction'.'' নিচের চিত্র থেকে বিষয়টি আরো বোধগম্য হবে।

**Motivators**

Satisfaction — No Satisfaction

**Hygiene Factors**

No dissatisfaction — Dissatisfaction

হার্জবার্গের মতে, যেসব উপাদান কর্মসন্তুষ্টির কারণ ঘটায় সেগুলো কর্মঅসন্তুষ্টির জন্য দায়ী উপাদানগুলো থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই কর্মঅসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে নির্মূল করতে পারলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে কাজের পরিবেশে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হবে ঠিকই, কিন্তু এতে কর্মীরা প্রেষণা পাবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবেনা। এ প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থাপক, কোম্পানি পলিসি ও প্রশাসন, তত্ত্বাবধান, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, কার্য পরিবেশ ও বেতন- এ উপাদানগুলোকে 'হাইজিন ফ্যাক্টরস' নামে অভিহিত করেছেন। এ উপাদানগুলো পর্যাপ্ত অবস্থায় বিরাজ করলে কর্মীরা অসন্তুষ্ট (dissatisfied) হবে না; কিন্তু এতে তারা সন্তুষ্টও (Satisfied) হবে না। কর্মীদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা দিতে হলে 'মোটিভেটরস' প্রেষণাসৃষ্টিকারী উপাদানের উপর ব্যবস্থাপককে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ তত্ত্বটি 'মোটিভেশন-হাইজিন' নামেও পরিচিত।

## সারসংক্ষেপ

প্রেষণা সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কর্মীদের প্রেষণার উপর গুরুত্ব দিয়ে বহু কথা বলেছেন। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো তত্ত্বই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সব তত্ত্বেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ১৯৫০ এর দশকে তিনটি তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছিল - চাহিদা-সোপান তত্ত্ব, এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব এবং দ্বি-উপাদান তত্ত্ব। এ তত্ত্বগুলো ঐ সময় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিলো। এখনো কর্মীদের প্রেষণার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বগুলো সর্বাধিক পরিচিত। চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি ব্যক্তির প্রয়োজনকে চাহিদার সোপানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। এক্স তত্ত্ব একটি নিরাশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মানুষকে অলস, কর্ম-বিমুখ এবং ফাঁকিবাজ হিসেবে দেখা হয়েছে। থিওরি ওয়াই আশাবাদী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে মনে করা হয় যে, কাজ মানুষের নিকট খেলা বা বিশ্রামের মতই স্বাভাবিক বিষয়। অন্যদিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব অনুযায়ী যেসব উপাদান কর্মসন্তুষ্টির কারণ ঘটায় সেগুলো কর্মঅসন্তুষ্টির জন্য দায়ী উপাদানগুলো থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই কর্ম অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে নির্মূল করতে পারলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে কাজের পরিবেশে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব হবে ঠিকই,কিন্তু এতে কর্মীরা প্রেষণা পাবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায়না।

# পাঠ ৫.৩ প্রেষণার সমসাময়িক তত্ত্বসমূহ

## Contemporary Theories of Motivation

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্বটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমতা তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রেষণার আদি তত্ত্বগুলো সুপরিচিত হলেও দূর্ভাগ্যবশত এর পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হওয়ার কারণে দিন দিন এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে সব কিছু হারিয়ে যায়নি। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে আদি তত্ত্বসমূহ। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ হচ্ছে এদের পর্যাপ্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বৈধ অনুসমর্থনকারী নথিপত্র। সাম্প্রতিককালে এ তত্ত্বগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে বলে এদেরকে ‘‘সমসাময়িক তত্ত্ব’’ বলা হয়না, বরং এ তত্ত্বগুলো বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীদেরকে কীভাবে অনুপ্রেষিত করা উচিৎ তার ব্যাখ্যা সংগঠনগুলোর সামনে তুলে ধরেছে। এ পাঠে আমরা বহুল প্রচলিত তিনটি সমসাময়িক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

### লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব

**Goal-Setting Theory**

এডউইন লক (Edwin Locke) এ তত্ত্বের প্রবক্তা, তিনি মনে করেন, ব্যক্তির কর্ম প্রেষণা ও কর্মসন্তুষ্টি তার প্রত্যাশা, চাহিদা, মূল্যবোধ ও মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। এ তত্ত্বে সংগঠনের প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টাকে পরিচালিত এবং শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে।

লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব অনুসারে সুনির্দিষ্ট ও কঠিনতর লক্ষ্য অধিকতর ও উন্নতমানের কর্মসম্পাদনে কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা থাকলে এবং কর্মীদের নিকট তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলে তারা কাজে বেশি মাত্রায় অনুপ্রেরণা পায়। তারা বুঝতে পারে-কী করতে হবে এবং তা করার জন্য কতটুকু প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়াও লক্ষ্য যদি কঠিন হয় এবং তা যদি কর্মীরা বুঝেশুনে গ্রহণ করে, তাহলে সেই কঠিন লক্ষ্য সহজ-লক্ষ্যের তুলনায় কর্মীদেরকে অধিকতর মাত্রায় অনুপ্রেষিত করে।

### সমতা তত্ত্ব

**Equity Theory**

ষাট এর দশকে J.S. Adams এ তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। প্রতিটি মানুষ ন্যায্য আচরণ পেতে আগ্রহী- এর উপর ভিত্তি করে এ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। এ ‘ন্যায্যতা’ বলতে সমতা বা ভারসাম্যকে বুঝানো হয়েছে। আর অসমতা বলতে এ তত্ত্বে বুঝানো হয়েছে অপরের তুলনায় ব্যক্তি সমান আচরণ পাচ্ছেনা। কর্মীর প্রেষণা ব্যাখ্যার জন্য সে কীভাবে সামাজিক বিনিময় সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কর্মী নিজেকে তার সহকর্মীর সাথে তুলনা করে ন্যায্য আচরণ পাচ্ছে কীনা তা নির্ণয় করে থাকে। সমতা ও অসমতার ফলে কর্মীর মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা নিচের চিত্রে দেখানো হলোঃ

| Perceived Ratio Comparison* | Employee’s Assessmant |
|---|---|
| $\frac{\text{Outcomes A}}{\text{Inputs A}} < \frac{\text{Outcomes B}}{\text{Inputs B}}$ | Inequity (underrewarded) |
| $\frac{\text{Outcomes A}}{\text{Inputs A}} = \frac{\text{Outcomes B}}{\text{Inputs B}}$ | Equity |

$$\frac{\text{Outcomes A}}{\text{Inputs A}} > \frac{\text{Outcomes B}}{\text{Inputs B}} \qquad \text{Inequity (overrewarded)}$$

* Person A is the employee, and person B is a relevant other or refereat.

সমতা তত্ত্ব কর্মীদের প্রেষণা দেওয়ার জন্য একটি কার্যকরী তত্ত্ব। এ তত্ত্বে আপেক্ষিকতার প্রভাব রয়েছে। সমতা অসমতার তুলনা করা যে কোন সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে, বিভিন্ন স্তরে প্রবলভাবে কাজ করে। এ কারণে, কর্মী যথেষ্ট পেয়ে থাকলেও অন্যের সাথে তুলনা করার কারণে সে অসন্তুষ্ট হয়। এক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপকগণ অসমতাজনিত অসন্তোষ পরিহার করে ন্যায়সংগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান পূর্বক কর্মীদের সন্তুষ্টি করার জন্য প্রেষণা দান করতে পারেন।

## প্রত্যাশা তত্ত্ব
## Expectancy Theory

বর্তমানে প্রেষণায় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তত্ত্বটি হচ্ছে Victor H. Vroom- এর প্রত্যাশা তত্ত্ব যা তিনি ১৯৬৪ সালে উপাস্থাপন করেন। এ তত্ত্বটি সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ প্রত্যাশার ভিত্তিতে অনুপ্রেষিত করে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে কর্মীর আকাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হলে সে অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করবে। Vroom এর মতে, যেকোনো কর্মীর প্রেষণা তার অনুমিত কাজের মূল্যের সাথে প্রত্যাশার শক্তির গুনন দ্বারা নির্ধারিত হয় যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে কর্মীকে সহায়তা করে। এ অনুমতি কাজ ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মকও হতে পারে। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে, কোনো কাজের অনুমিত মূল্যের ফল হচ্ছে প্রেষণা। আরো সহজভাবে বলা যায়, সংগঠনের কর্মীরা কোনো কাজ সম্পাদনের আগে উক্ত কাজ শেষে কী পুরস্কার পেতে পারেন তা বিবেচনা করেন। কাজ শেষে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলে ঐ কাজের প্রতি তার চাহিদা বেড়ে যায়। তিনি তিনটি ধারণার মাধ্যমে প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। এগুলো হচ্ছে- আকর্ষণ, প্রত্যাশা এবং শক্তি। এ তত্ত্বটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়-

শক্তি = আকর্ষণ × প্রত্যাশা

Force = Valence × Expectancy

এ তত্ত্বটি তিনটি সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করেছেঃ

১. প্রচেষ্টা - কর্মসম্পাদন সম্পর্ক
২. কর্মসম্পাদন - পুরস্কার সম্পর্ক
৩. পুরস্কার - ব্যক্তিগত লক্ষ্য সম্পর্ক

এ বিষয়টি আমরা একটি চিত্রের সাহায্যেও উপস্থাপন করতে পারি:

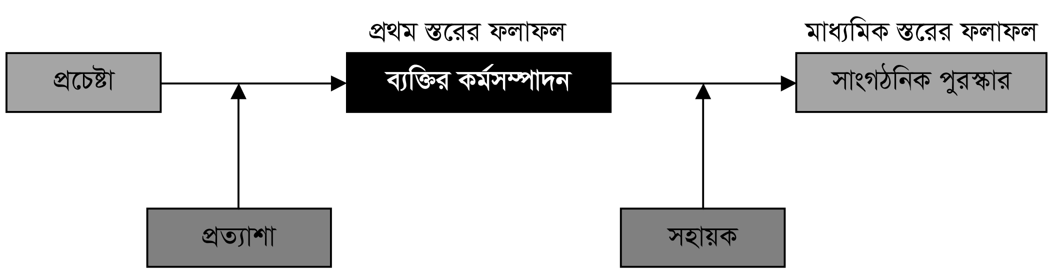


‘প্রত্যাশা’ হচ্ছে একটি কাজের প্রতি কর্মীর বিশ্বাস যা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এ তত্ত্বে ‘শক্তি’ বলতে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীর অনুভূতি ও প্রেষণার সমন্বয়ে সৃষ্ট কর্মীর ইচ্ছা শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া, ‘আকর্ষণ’ হচ্ছে কর্মীর আবেগজনিত ধনাত্মক মানসিক অবস্থা, ‘সহায়ক’ হচ্ছে কর্মসম্পাদন ও পুরস্কারের মধ্যকার সম্পর্ককে বুঝায়।

## সারসংক্ষেপ

সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে আদি তত্ত্বসমূহ। সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ হচ্ছে এদের পর্যাপ্ত পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বৈধ অনুসমর্থনকারী নথিপত্র। লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব অনুসারে সুনির্দিষ্ট ও কঠিনতর লক্ষ্য অধিকতর ও উন্নতমানের কর্মসম্পাদনে কর্মীদেরকে অনুপ্রাণিত করে। সমতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কর্মীর ন্যায্য আচরণের প্রাপ্যতা। কর্মক্ষেত্রে কর্মী নিজেকে তার সহকর্মীর সাথে তুলনা করে ন্যায্য আচরণ পাচ্ছে কীনা তা নির্ণয় করে থাকে। প্রত্যাশা তত্ত্বটি সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ প্রত্যাশার ভিত্তিতে অনুপ্রেষিত করে থাকে।

# পাঠ ৫.৪ লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
## Management by Objectives (MBO)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে বলতে পারবেন।
- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায় বলতে পারবেন।
- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা MBO- কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (management by result) নামেও পরিচিত। MBO-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটের জন্য বার্ষিক লক্ষ্যমালা (annual objectives) নির্ধারণ করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মীর জন্য অর্জনযোগ্য কর্মসম্পাদনভিত্তিক লক্ষ্য (performance objective) স্থির করা হয়। ১৯৫৪ সালে The Practice of Management নামক গ্রন্থে পিটার ড্রাকার নামে একজন আমেরিকান ব্যবস্থাপনা বিশারদ এ কৌশলের সুপারিশ করেন। সে-সময় থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়টির ওপর অনেক আলোচনা, সেমিনার, গবেষণা ও মূল্যায়ন হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার এ কৌশল ফলপ্রসূ হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এটি প্রত্যাশিত সাফল্য বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বহু ব্যবস্থাপনা বিশারদ মনে করেন, এমবিও কর্মীদের কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধির পাশাপাশি সংগঠনের প্রতি কর্মীদের প্রতিশ্রুতিও বৃদ্ধি করে। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আমরা এ পাঠে এর উদ্ভব, অর্থ ও বৈশিষ্ট্যাবলি, গুরুত্ব এবং লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করব।

### লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভব
### Emergence of Management by Objectives (MBO)

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা এমবিও হলো পরিমাপনীয় এবং অংশগ্রহণযোগ্য লক্ষ্যমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপক সিস্টেম। বিগত কয়েক দশকে উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উন্নতর তত্ত্বাবলির মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (MBO) অন্যতম। পরিকল্পনা ও অন্যান্য সব ব্যবস্থাপকীয় কাজে লক্ষ্যমালাই হলো মৌলিক বিবেচ্য বিষয় এবং বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীগণ এ সহজ সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তারা দেখেছেন যে, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের নিকট বোধগম্য ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যমালাই হলো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক লক্ষ্য কারো পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। নিয়োজিত কর্মীদেরকে পূর্বাহ্নেই জানতে হবে তাদের লক্ষ্যমালা কী, লক্ষ্যমালা অর্জন করতে কী কাজ ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কখন সে কাজটি করতে হবে ইত্যাদি। ব্যবস্থাপকীয় কার্যে লক্ষ্যের এ ব্যাপ্তি ও গুরুত্বের কারণেই লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটেছে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপণপূর্বক উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপকীয় পদ্ধতির (approach) প্রবক্তা বা উদ্ভাবক কে তা সুস্পষ্ট সনাক্ত করা সম্ভব হবে না। কারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞান মানুষের মনে এ বোধের সৃষ্টি করেছে যে, তারা একক বা দলীয় যেভাবেই কাজ করুক না কেন, তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী হয়ে ইঙ্গিত ফল লাভে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমালাই তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক। সময়ের গতি প্রবাহে এ উপলব্ধি বা বিশ্বাসকে একটি তত্ত্বীয় কাঠামোতে উপনীত করতে বহু তাত্ত্বিক ও ব্যবস্থাপনা বিশারদ অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে পিটার এফ ড্রাকারের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যবস্থাপকীয় স্বনিয়ন্ত্রণের প্রসার ও উন্নয়নের উপায় হিসেবে তিনি

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করছেন। তিনি বলেন: "ব্যবস্থাপকদের প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদন অবশ্যই কারবারের কার্য-সম্পাদনীয় অভিলক্ষ্য থেকে উদ্ভূত হওয়া দরকার এবং তাদের কার্যফলাফল পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা হয় কারবারের সাফল্যের পেছনে তাদের অবদানের আলোকে " (The performance that is expected of the manager must be derived from the performance goals of the business, his result must be measured by the contribution they make to the enterprises)।

বর্তমান ব্যবসায় জগতে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রায় সবগুলো বৃহদাকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেই অনুসৃত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনার এ পদবাচ্যটি এত ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে যে, সত্তর দশকের শেষের দিকে বহু ব্যবস্থাপনা-বিশারদ ও লেখক লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপর সাত শতাধিক প্রবন্ধ ও বই রচনা করেছেন। নিরূপণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক লক্ষ্যমালার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপণই হলো লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যসূচির সাধারণ নির্ণায়ক, যা তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করে তুলেছে।

## লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
## Definition of MBO

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বর্তমান ব্যবস্থাপনা জগতে প্রয়োগকৃত একটি নতুন ব্যবস্থাপকীয় পদ্ধতি। ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও অনেকের কাছেই লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অর্থ সুস্পষ্ট নয়। কেউ এটাকে একটি মূল্যায়নের কৌশল, কেউ প্রণোদনার কৌশল, আবার কেউ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে মনে করেন। এরূপ বহুবিধ অর্থবোধকতার কারণে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাও পরিস্থিতি এবং সময়ভেদে ভিন্নতর হয়। এ ধারণার (concept) উদ্ভাবন থেকে অদ্যাবধি বেশ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সে সাথে আলোচ্য পদবাচ্যটির অন্তর্নিহিত অর্থের মাত্রাগত রূপটিও পরিবর্তিত হয়ে একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও মূল লক্ষ্যসমূহ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত হয় এবং তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে গোটা সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের অবহিত করা হয়। অতপর এ মূল লক্ষ্যমালাকে প্রয়োজনীয় উপ-লক্ষ্যে (sub-objective) বিভক্ত করে অধস্তনের উপর কার্যভার অর্পণ করা হয়। মূল লক্ষ্য হাসিলের উপায় হিসেবে উপ-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কার্যপ্রয়াস চালানো ও কার্যনির্বাহ করাকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। গ্রিফিন (Ricky W. Griffin) এর মতেঃ "Management by objectives is the process of collaborative good setting by a manager and subordinate."

Koontz ও Weihrich লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন: *লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম যা ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রমসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে সমন্বিত করে এবং কার্যকর ও দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিক লক্ষ্যমালা অর্জনের নিমিত্ত সচেতনতার সাথে প্রয়াস চালায়।* [Management by Objectives is a comprehensive managerial system that integrates many managerial activities in a systematic manner, and is consciously directed toward the effective and efficient achievement of organizational and individual objectives.]

<u>উপরের সংজ্ঞায় লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার দুটি প্রধান উপাদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়:</u>

(ক) মুখ্য ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রম ও প্রক্রিয়াসমূহকে যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি সিস্টেম হলো এমবিও।

(খ) প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অভিলক্ষ্যসমূহ (goals) ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্য মূল্যায়ন, নির্বাহীদের পারিতোষিক প্রদান, জনশক্তি পরিকল্পন এবং ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন, উন্নয়ন ও প্রসার লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এমবিও- কে ব্যবস্থাপনার একটি স্টাইল হিসেবে অভিহিত করা যায়। অনেকে এমবিও- কে 'কার্যফলের জন্য ব্যবস্থাপনা' (management for result) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এমবিও- এ ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ব্যবস্থাপকগণ উত্তমরূপে তাদের কার্য সম্পাদন করতে পারেন –

(ক) যদি তারা তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন;
(খ) যদি তাদের কাজের অগ্রগতি মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করা হয়; এবং
(গ) যদি প্রয়োজনবোধে বিকল্প সঠিক পন্থা গ্রহণ করা হয়।

এমবিও- এর তিনটি দিক রয়েছে:

১. একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে অর্জনের জন্য কর্মীদের (বিশেষ করে ব্যবস্থাপকদের) লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
২. অগ্রাধিকারের আলোকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন কর্মকান্ড চলতে থাকে তখন সময়ে সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অগ্রগতি যাচাই করা।
৩. ফলাফল মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তা অবহিত করা এবং বিচ্যুতি বা ত্রুটি ধরা পড়লে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সমাধানমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

## লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলি

### Distinguishing Characteristics of MBO

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা আধুনিক ব্যবস্থাপনা জগতে উদ্ভাবিত একটি উন্নততর ও ব্যাপকভাবে গৃহীত ব্যবস্থাপকীয় কৌশল। এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বিগত চার দশক ধরে। এ ব্যাপক প্রসারতার ফলে এর কতকগুলো লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যাবলি হলো:

১. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম
২. 'থিওরি ওয়াই' (Theory Y) ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব
৩. কার্যমূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় সমাধানের কৌশল
৪. স্বল্পকালীন লক্ষ্যমালা এবং প্রণোদনার উপর গুরুত্বারোপণ
৫. দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি
৬. পরিমাণগত বা সংখ্যাত্মক লক্ষ্যমালা
৭. গুণগত লক্ষ্যমালা।

**ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম (A comprehensive management system)ঃ** লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবিত হওয়ার পর থেকে সামগ্রিক ব্যবস্থাপকীয় কর্মকাণ্ডে এটি একটি ব্যাপক কার্যপরিসর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমবিও । আর এমবিও- কে ঘিরে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি যথা পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণকার্য প্রণীত হয়। এসব কার্যাবলিকে এমবিও প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত যৌক্তিক ও অনুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

**থিওরি ওয়াই ফিলোসফি (Theory Y Philosophy):** ডগলাস ম্যাক্গ্রেগর (১৯৬০) কর্তৃক উদ্ভাবিত ওয়াই তত্ত্ব (Theory Y) এমবিও- এর মূলগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এই ওয়াই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে –

- মানুষের নিকট কাজ হলো খেলাধুলা বা বিশ্রামের ন্যায় একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম।
- লক্ষ্যার্জনের নিমিত্ত অর্পিত দায়িত্বভার পালনকালে লোকেরা স্ব-নির্দেশনা ও স্ব-নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা রাখে।
- উপযুক্ত পারিতোষিক লোকদের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে উদ্বুদ্ধ করে।
- সাধারণভাবে লোকজন দায়িত্ব পেতে চায়।
- মানুষ কল্পনা শক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার অধিকারী।

উপরোক্ত অনুমিতির ভিত্তিতে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এমবিও মতবাদ গৃহীত হয়েছে। থিওরি ওয়াই এবং এমবিও উভয়ের ক্ষেত্রেই স্ব-নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

**কার্যমূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধানের কৌশল (A technique of performance appraisal and problem solving approach):** এমবিও প্রক্রিয়াতে সাময়িক ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রমসমূহের যৌক্তিক ও অনুক্রমিক বিন্যাস একজন ব্যবস্থাপককে তার প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্যসমূহ এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে। সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন লক্ষ্যমুখিতার দরুন কর্মীদের কার্য পরিমাপকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান, জনশক্তি বা কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচির কৌশল হিসেবে এমবিও গৃহীত হয়।

**স্বল্পকালীন লক্ষ্যমালা এবং প্রণোদনার উপর গুরুত্বারোপণ (Emphasis on short-term objectives and motivation):** বিভিন্ন গবেষণা, কনসালট্যান্ট ও ব্যবস্থাপকগণের অভিমতানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বা কর্মীর আলাদা সুস্পষ্ট লক্ষ্যনির্ধারণের মাধ্যমেই কর্মীদের কর্মকুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা যায়। সামগ্রিক লক্ষ্য নয় বরং প্রতিটি কর্মী বা গ্রুপের বিশেষ অভিলক্ষ্য কী তা সংশ্লিষ্ট কর্মী বা গ্রুপকে অবহিত করতে হবে এবং এ অভিলক্ষ্যসমূহ অবশ্যই সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। এরূপ অভিলক্ষ্য নির্ধারণ কর্মীদের প্রণোদিত করে । অবশ্য কর্মীদেরকে প্রণোদিত করার জন্য তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

**দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি (Inclusion of long-range plans):** যদিও স্বল্পকালীন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য এমবিও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তথাপি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই মূলত চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্বল্পকালের জন্য প্রণীত লক্ষ্যমাত্রা সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনের উপায় বিশেষ। এজন্য প্রথমেই দীর্ঘকালীন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় এবং এর সাপোর্টিভ লক্ষ্য হিসেবে স্বল্পকালীন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

**পরিমাণগত লক্ষ্যসমূহ (Quantitative objectives):** এমবিও কর্মসূচিতে গৃহীত লক্ষ্যমালা মেয়াদ-অন্তে পরিমাপ করা যায়। প্রতি লক্ষ্যের সংখ্যাত্মক রূপ প্রকাশ করা হয়। সামগ্রিক লক্ষ্যমালাকে যেমন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়, তেমনি প্রতিটি কর্মী বা কর্মীর উপর অর্পিত লক্ষ্যসমূহকে সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করা হয়। এভাবে সংখ্যার আকারে নির্ধারণ করে দেয়া হয় বিধায় কর্মীরা স্ব-স্ব-দায়িত্ব ও কর্তব্য নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করতে পারে।

**গুণগত লক্ষ্যমালা (Qualitative objectives)ঃ** কিছু কিছু লক্ষ্যকে সংখ্যায় প্রকাশ সম্ভব নয়। সংগঠনে কাঠামোর উপরের স্তরে সুনিদিষ্ট গাণিতিক মাত্রাতে কোন নির্বাহীর কাজকে বেঁধে দেয়া যায় না। প্রায়শ সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যমালা বেঁধে দেয়া হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন নির্বাহী 'কতটুকু ভালোভাবে' কাজটি করতে পারবে তা মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়ায়। তাই এসব লক্ষ্যের বেলায় পরিমাণগত প্রকাশের চেয়ে গুণগত প্রকাশের উপর জোর দেয়া হয়।

## লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

## Significance of MBO

গবেষণার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, মানুষ কাজ করে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং তার এ প্রয়োজন শুধুমাত্র দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে আরো উচ্চপর্যায়ের প্রয়োজন তথা সামাজিক প্রয়োজন, অহংবোধ এবং আত্মবিকাশ সংক্রান্ত মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি পরিপূরণের জন্য প্রত্যাশী। একজন ব্যবস্থাপক মর্যাদা, সম্মান, স্বীকৃতি এবং তার কাজের জন্য প্রশংসা পেতে আগ্রহী। কর্মক্ষেত্রে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ও বুদ্ধিমত্তা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে আত্মসন্তুষ্টি বিধান করতে চান, অর্থাৎ অহংবোধজনিত প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে চান। এটি এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন (operational autonomy)। MBO ব্যবস্থাপনা কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই প্রকার স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য একটি উত্তম হাতিয়ার। এ কৌশল ব্যবহার করা হলে ব্যবস্থাপকগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগ বা কোম্পানির কাজে অধিকমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন, তাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি (commitment) বৃদ্ধি পায় এবং সংগঠনে তাদের উন্নতি অগ্রগতির পথ প্রসারিত হয়।

MBO একটি প্রণোদনার হাতিয়ারও বটে। গবেষণা হতে দেখা গিয়েছে যে, কোনো লোক যদি তার কাজের উদ্দেশ্য ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে তার নিজস্ব কর্মকাণ্ড কীভাবে সম্পর্কিত তা

ঠিকমত বুঝতে পারেন তবে তার কার্যসম্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এখানে প্রসঙ্গত পিটার এফ ড্রাকার- এর একটি দৃষ্টান্তের আলোকে একটি উদাহরণ দেয়া যায়: তিনজন লোক একটি নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কী করছে? তখন প্রথম কর্মী উত্তর দিল, সে ইট ভাঙ্গার কাজ করছে, দ্বিতীয় জন উত্তর দিল, সে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করছে; এবং তৃতীয় জন বলল, সে একটি মসজিদ তৈরি করছে। ড্রাকারের মতে, তৃতীয় কর্মী MBO ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছে যে, সে একটি কাজের মতো কাজ করছে। আগ্রহ ও প্রণোদনা বৃদ্ধির জন্য এরূপ অনুভূতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন লোক যখন বুঝতে পারে যে, সে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করছে, তখন তার মধ্যে অব্যাহত উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এভাবে উচ্চ পর্যায়ে কার্য সম্পাদনের জন্য MBO একটি প্রেষণার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

## লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়

**What Steps are Involved in the Implementation of MBO Program**

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো ধারাবাহিক ও যৌক্তিক কতগুলো পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। এরূপ প্রক্রিয়াতে সাধারণত চারটি পদক্ষেপ জড়িত থাকে এবং পদক্ষেপগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এটি এমবিও প্রক্রিয়া নামেও পরিচিত।

১. লক্ষ্যমালা নির্ধারণ (Setting Objectives);
২. কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (Developing Action Plans);
৩. কালান্তিক পর্যালোচনা (Periodic Review);
৪. কার্য মূল্যায়ন (Performance Appraisal)

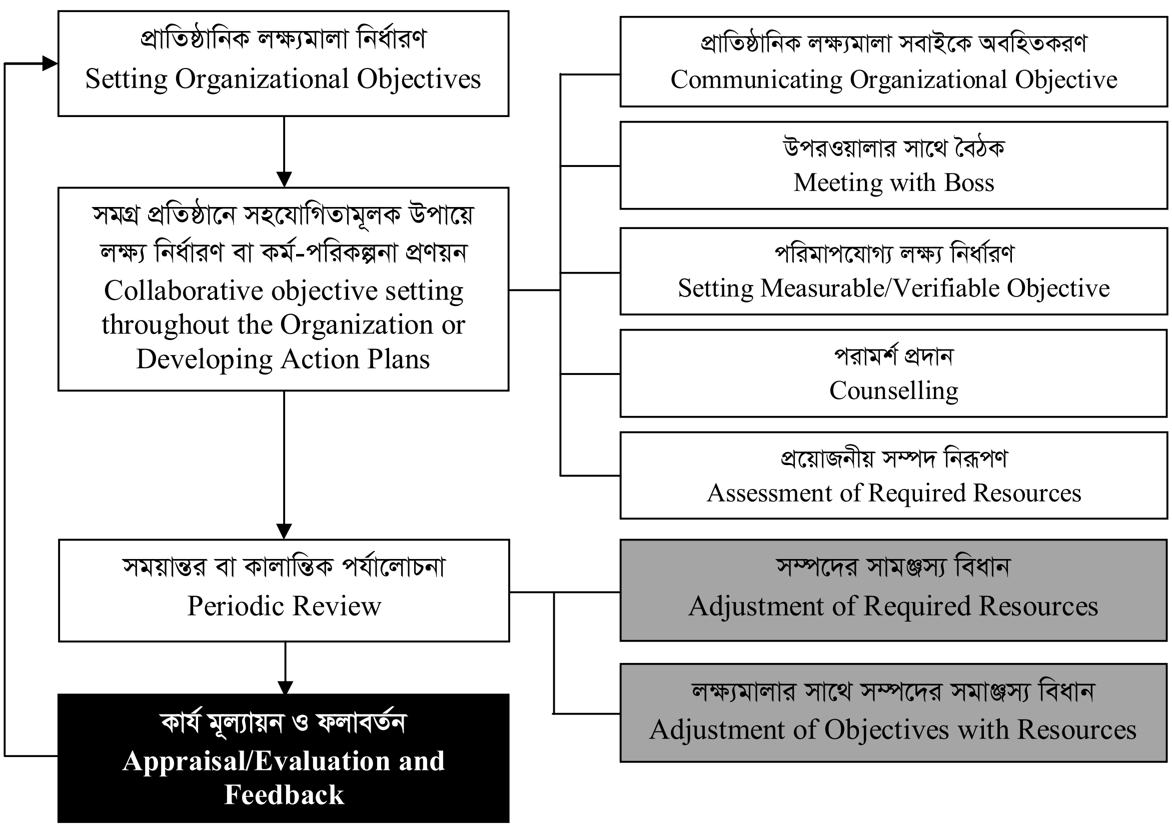


চিত্র: MBO প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ

এ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক সূচনা ঘটে সংগঠন কাঠামোতে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের দ্বারা। প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক প্রথমে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যা সংগঠন কাঠামোর নিম্নের স্তরে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের উপর মূল লক্ষ্যের সাপোর্টিভ লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। নিম্নে এমবিও প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো আলোচিত হলো:

**১. লক্ষ্যমালা নির্ধারণ (Setting objectives):** লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সূচনা বিন্দু হলো একটি নির্দিষ্ট ও যথাযথ পরিকল্পনাঙ্গনে সুনির্দিষ্ট এবং প্রতিপাদনীয় লক্ষ্যমালা নির্ধারণ। এ নির্ধারিত লক্ষ্যমালাই এমবিও প্রক্রিয়া চক্রের মূল ভিত্তি এবং অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ এ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।
লক্ষ্যমালা ব্যবস্থাপকীয় স্তরভিত্তিক কাঠামোর উপরে প্রথমে নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পরিসৃত হয়ে নিম্নস্তর অবধি পৌঁছায়। উর্ধ্বতন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আর্থিক ও কারিগরি শক্তি-সামর্থ্যের বিবেচনার প্রেক্ষিতে অর্জনযোগ্য হওয়া আবশ্যক। এজন্য অধীনস্থদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপকদের আধিপত্যকারী কিংবা পরিত্যাগকারী ভূমিকার কোনটাই থাকতে পারবে না। "আমি লিখিত আকারে যা আপনাদেরকে অবহিত করব তাই লক্ষ্য" এরূপ যেমন প্রত্যাশা করা হয় না, তেমনি একজন নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থাপকের মত ''আপনারা যা লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবেন তাতেই আমার সায় আছে'' এরূপ ভূমিকাও কাম্য নয়। বরং এমবিও তত্ত্বানুযায়ী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণকালে উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়যোগ্য সম্পর্ক বিরাজ করবে।

এছাড়া লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণকালে লক্ষ্যের পরিমাণগত নির্দেশক, যেমন-বিক্রয় বা মুনাফার শতাংশ, ব্যয়স্তর ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

**২. কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (Developing action plans):** প্রাথমিকভাবে গৃহীত লক্ষ্যসমূহ অর্জনার্থে কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যাশিত লক্ষ্যমালা অর্জনের জন্য প্রতিটি স্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অধস্তনদের প্রত্যেকের উপ-লক্ষ্য ও পরিকল্পনা যেন পরস্পরের পরিপূরক হয় এবং কেউ যেন স্ব স্ব উপ-লক্ষ্যার্জন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদন না করে, এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এজন্য প্রতিটি লক্ষ্য ও উপ -লক্ষ্যার্জনের দায়িত্বভার নির্দিষ্ট কর্মীর উপর অর্পিত হবে এবং সে মোতাবেক প্রত্যেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

**৩. কালান্তিক পর্যালোচনা (Periodic review)ঃ** কর্মীরা পরিকল্পনা অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো কর্মীদের কার্য মনিটরিং করা। এজন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মীরা নির্দিষ্ট সময় পরপর (যেমন-তিনমাস, ছয়মাস) মিটিং এ বসে। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য এ কালান্তিক কার্য পর্যালোচনা ও চেক আপের দরুন প্রত্যেক কর্মী তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং কোন প্রকার ব্যর্থতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরিয়ে নিতে পারে। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মীর মৃত্যু কিংবা অনুরূপ কোন দুর্ঘটনার দরুন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমালা অর্জন ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, এ পর্যালোচনার দ্বারা উপরওয়ালারা অধস্তনদেরকে ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও অন্যান্য তথ্য আদান-প্রদানে সক্ষম হন।

**৪. কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন (Performance appraisal):** এমবিও -এর চূড়ান্ত পদক্ষেপে নির্দিষ্ট মেয়াদের (প্রধানত এক বছর) নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কার্যমূল্যায়ন করা হয়। নির্ধারিত সময় শেষে কর্মীরা তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব কতটুকু সাফল্যের সাথে পালন করল তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করার জন্য উপরওয়ালা ও অধস্তনগণএকত্রিত হন। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় কোনো কর্মী বা ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিত্বকে অধিকতর গুরুত্বারোপণ কিংবা কাজের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদির অবকাশ নেই। শুধুমাত্র সম্পাদিত কার্যফলাফল ও মানের নিরিখেই প্রতিটি কর্মীর মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যাশিত কার্যফলাফল অর্জিত হলে তার স্বীকৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ কর্মীদের পদোন্নতি, বোনাস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আর লক্ষ্যমালা থেকে অর্জিত ফলাফলের নেতিবাচক বিচ্যুতি হলে ভবিষ্যতের জন্য সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হয়। এভাবে এমবিও প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পদক্ষেপে কার্য মূল্যায়নকালে কর্মীদেরকে অধিকতর প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আচরণগত নীতিমালাকে বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়:

(ক) অংশগ্রহণের নীতি (Principle of participation): *সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লক্ষ্যমালা নির্ধারণকালে কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।*
(খ) ফলাবর্তন নীতি (Principle of feedback): *উপযুক্ত ফলাবর্তনের মাধ্যমে কর্মীদের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।*
(গ) প্রতিদানমূলক স্বার্থ নীতি (Principle of reciprocated interest): *লক্ষ্য এমন হওয়া আবশ্যক যাতে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়েই কর্মীদের ব্যক্তিক লক্ষ্য অর্জিত হয়।*
(ঘ) স্বীকৃতির নীতি (Principle of recognition): *সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে কর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।*

## সারসংক্ষেপ

লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বা এমবিও হলো পরিমাপনীয় এবং অংশগ্রহণযোগ্য লক্ষ্যমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপক সিস্টেম। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও মূল লক্ষ্যসমূহ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত হয় এবং তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে গোটা সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের অবহিত করা হয়। অতপর এ মূল লক্ষ্যমালাকে প্রয়োজনীয় উপ-লক্ষ্য বিভক্ত করে অধস্তনের উপর কার্যভার অর্পণ করা হয়। মূল লক্ষ্য হাসিলের উপায় হিসেবে উপ-লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কার্যপ্রয়াস চালানো ও কার্যনির্বাহ করাকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো ধারাবাহিক ও যৌক্তিক কতগুলো পদক্ষেপের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কার্য প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা। এরূপ প্রক্রিয়াতে সাধারণত চারটি পদক্ষেপ জড়িত থাকে এবং পদক্ষেপগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এটি এমবিও প্রক্রিয়া নামেও পরিচিত। পদক্ষেপগুলো হলো - লক্ষ্যমালা নির্ধারণ, কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, কালান্তিক পর্যালোচনা এবং কার্য মূল্যায়ন।

## ইউনিট মূল্যায়ন

১. প্রেষণা কি একটি প্রক্রিয়া? বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা করুন।
২. প্রেষণা ধারণাটির বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করুন।
৩. কর্মসম্পাদনে প্রেষণার গুরুত্ব কী? ব্যাখ্যা করুন।
৪. প্রেষণা কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে? প্রেষণায় "উৎপাদন বৃদ্ধি" ও "দক্ষতা বৃদ্ধি" কি একে অপরের পরিপূরক? ব্যাখ্যা দিন।
৫. প্রেষণার আদি তত্ত্বগুলো বর্তমান ব্যবসায়িক পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ? এগুলোর ব্যবহার কীভাবে একজন ব্যবস্থাপককে সাহায্য করতে পারে? আলোচনা করুন।
৬. চাহিদা-সোপান তত্ত্বটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।
৭. কর্ম মনোভাব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা করুন।
৮. থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই এর মধ্যে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে?
৯. প্রেষণার লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
১০. সমতা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? বর্ণনা করুন।
১১. প্রত্যাশা তত্ত্বটি ব্যবস্থাপকদের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক বলে মনে করেন? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখান।
১২. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৩. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে একটি ব্যাপক ব্যবস্থাপকীয় সিস্টেম হিসেবে সংজ্ঞায়িত কেন করা হয়? ধারণাটি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।
১৪. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৫. ব্যবস্থাপনার জগতে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কতখানি? বর্ণনা করুন।
১৬. লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার যে বিজ্ঞানভিত্তিক কার্য প্রক্রিয়া রয়েছে তা চিত্রসহকারে আলোচনা করুন।